OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 320 - 328
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

জনসমুদ্রে নিঃসঙ্গ পথচারী : বাংলা উপন্যাসের নগর-দর্শন

নয়ন সরকার
স্বাধীন গবেষক
Email ID: nayansarkar@zohomail.in

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
ফ্লানুর, নাগরিক আধুনিকতা, কল্লোল যুগ, জীবনানন্দ দাশ, অস্তিত্ববাদ, ডিজিটাল নগরী, বিচ্ছিন্নতা।

Abstract

এই গবেষণাপত্রটি বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তনে 'ফ্লানুর' বা নাগরিক ভবঘুরে সত্তার তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক রূপান্তর বিশ্লেষণ করে। ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার এবং জার্মান দার্শনিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন প্রবর্তিত 'ফ্লানুর' তত্ত্বের নিরিখে এখানে দেখানো হয়েছে যে, আধুনিক নগরী কেবল একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র নয়, বরং তা বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্তিত্ববাদী অন্বেষণের এক জটিল মঞ্চ। বিংশ শতাব্দীর 'কল্লোল' যুগের উপন্যাসে নাগরিক অস্থিরতার মাধ্যমে যে পথচারী সত্তার উন্মেষ ঘটেছিল, তা জীবনানন্দ দাশের পরাবাস্তব ও নির্জন ঘ্রাণতাত্ত্বিক মানচিত্রে এক ধ্রুপদী মাত্রা লাভ করে। পরবর্তীকালে, ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও 'ক্ষুধার্ত' প্রজন্মের দ্রোহে ফ্লানুর সত্তাটি কীভাবে 'প্রতিবাদী পরিব্রাজক'-এ রূপান্তরিত হয়েছে, তার একটি নিবিড় পাঠ এখানে উপস্থাপিত। পরিশেষে, একুশ শতকের ডিজিটাল যুগে নজরদারি ও স্মার্টসিটির প্রেক্ষাপটে 'ভার্চুয়াল ফ্লানুর'-এর যে নতুন রূপান্তর ঘটেছে, তা সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রমাণ করে যে, বাংলা উপন্যাসের এই 'নিঃসঙ্গ পথচারী' কেবল একটি সাহিত্যিক চরিত্র নয়, বরং তা বিশ্বজনীন আধুনিকতা ও নাগরিক বিচ্ছিন্নতার এক অবিনশ্বর দলিল।

Discussion

আধুনিকতা ও নাগরিক সভ্যতার বিবর্তন কেবল স্থাপত্য বা ভূগোলের পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগতের এক আমূল রূপান্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বসাহিত্যে যখন যান্ত্রিক সভ্যতা ও নগরজীবনের জয়গান শুরু হয়, তখন সেই অতিকায় নগরের বুকে জন্ম নেয় এক বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক সত্তা— যাঁকে আমরা 'ফ্লানুর' বা 'নাগরিক ভবঘুরে' বলে চিহ্নিত করি। ফ্লানুর কেবল সেই ব্যক্তি নন যিনি রাজপথে পরিভ্রমণ করেন; বরং তিনি হলেন সেই তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষক, যিনি ভিড়ের উন্মাদনার মাঝে থেকেও এক অলঙ্ঘ্য নির্জনতা বজায় রাখেন। তাঁর পদচারণা কোনো বৈষয়িক লাভের প্রত্যাশায় নয়, বরং নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও বিমূর্ত রূপকে পাঠ করার এক শৈল্পিক প্রয়াস।

> "The flâneur is someone who abandoned himself to the crowd, but only to observe it from a distance. For him, the city is a landscape, a room, a library."[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাশ্চাত্যের শার্ল বোদলেয়ার ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের তাত্ত্বিক কাঠামোয় ফ্লানুর হলেন আধুনিকতার এক 'অস্তিত্ববাদী নায়ক'। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে এই ভাবনার উন্মেষ ও বিকাশ এক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের সহজ-সরল 'পথিক' বা 'যাযাবর' সত্তাটি যখন বিশের দশকের 'কল্লোল' যুগের প্রভাবে কলকাতার কর্কশ ফুটপাতে এসে আছড়ে পড়ল, তখনই বাংলা উপন্যাসে জন্ম নিল এক নতুন ঘরানার নায়ক। এই নায়ক আর পল্লীর শ্যামল ছায়ায় শান্তির অন্বেষণ করেন না, বরং ট্রামের ঘর্ঘর শব্দে, বিজন গলির ল্যাম্পপোস্টের হলুদ ম্লান আলোয় এবং মেস জীবনের রুদ্ধশ্বাস একাকীত্বে নিজের অস্তিত্বের মানে খুঁজে ফেরেন। বাংলা উপন্যাসের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কল্লোল যুগের রোমান্টিক বিচ্ছিন্নতা থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশের পরাবাস্তব বিষণ্ণতা, কিংবা দেশভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক হাহাকার— প্রতিটি বাঁকেই এই 'ভবঘুরে' চরিত্রটি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হল সেই বিবর্তনের ধারাটিকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা। আমরা দেখব, কীভাবে বাংলা উপন্যাসের নায়ক নাগরিক কোলাহলকে উপেক্ষা করে এক 'নির্জনতার ভূগোল' নির্মাণ করেন এবং কেন তাঁর এই গন্তব্যহীন পদচারণা আসলে এক প্রকারের তাত্ত্বিক প্রতিরোধ। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাসের এই বিশেষ ধারাটিকে স্থাপন করে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, তিলোত্তমা কলকাতার রাজপথে হেঁটে চলা এই বিষণ্ণ পথিকটি আসলে বিশ্বজনীন আধুনিকতারই এক অবিচ্ছেদ্য প্রতিচ্ছবি।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'কল্লোল' যুগ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক এক বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণ। এই সময়েই প্রথম গ্রামবাংলার চিরায়ত স্নিগ্ধতা ও রোমান্টিক মায়াচ্ছন্নতা ছিন্ন করে বাংলা সাহিত্য কলকাতার কর্কশ ফুটপাতে আছড়ে পড়ে। কল্লোলীয় লেখকদের লেখনীতে কলকাতা কেবল একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র রইল না, বরং তা হয়ে উঠল এক অতিকায়, যান্ত্রিক এবং নির্দয় 'শহর'। এই শহরের জনসমুদ্রের মাঝে যে চরিত্রটি প্রথমবার একাকীত্বের বর্ম পরে আত্মপ্রকাশ করল, সেই হল আমাদের আলোচ্য 'ফ্লানুর' বা আধুনিক ভবঘুরে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসে আমরা প্রথমবার এক রুক্ষ ও নগ্ন বাস্তবতার সম্মুখীন হই। এখানে কলকাতার অলিগলি, নর্দমা আর বস্তি এলাকাগুলো কোনো ললিত কলার বিষয় নয়, বরং এক আদিম ও পাশবিক অস্তিত্বের ধারক।

> "এই গলির অন্ধকারে কত সহস্র বছর ধরিয়া যে পঙ্কিলতা জমিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানকার মানুষেরা এই পাঁকেরই অংশ।"[২]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নায়ক বা পথচারী যখন কলকাতার অন্ধকার গলি দিয়ে হাঁটে, তখন সে শার্ল বোদলেয়ারের সেই 'প্যারিসীয় ফ্লানুর'-এর মতোই বিষণ্ণ। তাঁর বিখ্যাত কবিতার পংক্তি — "আমি কবি মেথর-পল্লীর, আমি কবি ফুটপাথের"[৩] — উপন্যাসের গদ্যেও এক বিশেষ ব্যঞ্জনা পায়। এখানকার ভবঘুরে সত্তাটি আর নিছক ভ্রমণপিপাসু নয়; সে দারিদ্র্য, পঙ্কিলতা আর নাগরিক অবক্ষয়ের এক নির্লিপ্ত সাক্ষী। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েও ব্রাত্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ভবঘুরে চরিত্রটি আসলে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের পতনকে এক দার্শনিক দূরত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করে, যা বিশ্বসাহিত্যের 'অস্তিত্ববাদী বিচ্ছিন্নতা'র এক আদিমতম নিদর্শন। কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান স্থপতি বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' বা সমসাময়িক উপন্যাসগুলোতে 'ফ্লানুর' চরিত্রটি এক ভিন্নমাত্রা লাভ করে। এখানে ভবঘুরে সত্তাটি আরও বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও সংবেদনশীল। বুদ্ধদেব বসুর নায়ক কলকাতার মেস-জীবনের রুদ্ধশ্বাস একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে রাজপথের আশ্রয় নেয়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যেমন বলেছিলেন, ফ্লানুর-এর কাছে রাস্তা হলো তাঁর বসার ঘর। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসেও দেখা যায়, নায়ক ট্রামের জানালায় মাথা রেখে কিংবা গোলদীঘির বেঞ্চে বসে যে সময়টুকু কাটায়, সেটুকুই তাঁর প্রকৃত জীবন। সে জনমানুষের ভিড়ে থেকেও এক অদৃশ্য কাঁচের দেয়াল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখে। এটিই হল প্রকৃত ফ্লানুর-এর বৈশিষ্ট্য— যিনি কোলাহলকে নৈঃশব্দ্যে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁর পদচারণা কোনো বৈষয়িক উন্নতির জন্য নয়, বরং এক অনির্দেশ্য সুন্দরের বা বিষণ্ণতার সন্ধানে। এই পর্যায়ে এসে বাংলা উপন্যাসের নায়ক প্রথম অনুভব করেন যে, আধুনিক শহর এক 'গোলকধাঁধা'। কল্লোল যুগের লেখকরা দেখালেন যে, নগরায়ন মানুষকে কেবল যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধাই দেয়নি, বরং তাকে তার আপন সত্তা থেকে বিচ্যুত করেছে। এই বিচ্ছিন্নতাই একজন সাধারণ মানুষকে 'ফ্লানুর'-এ রূপান্তরিত করে। সে যখন কলকাতার ট্রামলাইন, ম্লান গলি আর গুমোট মেসবাড়ির মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তখন সে আসলে নিজের হারানো অস্তিত্বকেই খুঁজে ফেরে। এই ভবঘুরেপনা এক প্রকারের নীরব প্রতিবাদ— পুঁজিবাদী যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক প্রতিরোধ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কল্লোলীয় উপন্যাসে 'ফ্লানুর' বা ভবঘুরে সত্তার বিকাশে কলকাতার 'মেস-জীবন' এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই কবি বলেছেন –

> "মাঝে মধ্যে মনে হয়, এই চেনা শহরটা এক অচেনা গোলকধাঁধা। ট্রামের জানলা দিয়ে যে আলোগুলো সরে যায়, তারা যেন আমারই স্মৃতির একেকটি বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গ।"[৪]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখি, মেসের একচিলতে ঘর যখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের কাছে কারাপ্রকোষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখনই সে রাজপথের আশ্রয় নেয়।

> "আমি সেই চটকলের ধোঁয়া-মাখা ফুটপাথের কবি,/ যেখানে ধুলোবালির গায় লেগে আছে মেহনতি মানুষের দীর্ঘশ্বাস।"[৫]

ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর তত্ত্বে বলেছিলেন, ফ্লানুর নগরের রাজপথকে তাঁর 'অন্দরমহল' হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা উপন্যাসেও ঠিক এই চিত্রটিই ফুটে ওঠে। মেসবাড়ির ডাল-ভাতের একঘেয়েমি আর কেরানি জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে নায়ক যখন ডালহৌসি স্কোয়ার বা গঙ্গার ঘাটে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, তখন সেই 'রাস্তা'ই হয়ে ওঠে তাঁর প্রকৃত মুক্তির আঙিনা। এই 'মেস-কালচার' বাঙালি ফ্লানুরকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়ে তুলেছে — যেখানে সে পকেটে পয়সা না থাকলেও রাজপথের অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ফ্লানুর-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর 'পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টি'। কল্লোল যুগের উপন্যাসে আমরা দেখি, লেখক যেন এক চলন্ত ক্যামেরার মতো শহরকে দেখছেন। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখকদের ছোটগল্প ও উপন্যাসে কলকাতার বস্তি, নর্দমা, ট্রামডিপো এবং স্ট্রিট-ল্যাম্পের আলো-আঁধারি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা জার্মান 'এক্সপ্রেশনিজম' বা অভিব্যক্তিবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানকার ভবঘুরে নায়ক কেবল দৃশ্য দেখে না, সে দৃশ্যের অন্তর্নিহিত বিষণ্ণতাকে আস্বাদন করে। সে যখন কোনো অন্ধগলিতে একাকী দেহপসারিনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিংবা ফুটপাথে মরণাপন্ন ভিখারিকে লক্ষ্য করে, তখন সে তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করে না; বরং সে সেটিকে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার এক অমোঘ পরিণতি হিসেবে নির্লিপ্তভাবে পাঠ করে। এই 'নির্লিপ্ততা' হল আন্তর্জাতিক ফ্লানুর তত্ত্বের মূল ভিত্তি, যা কল্লোলীয় লেখকরা অত্যন্ত নিপুণভাবে বাংলা উপন্যাসে ধারণ করেছেন। পাশ্চাত্যে জাঁ-পল সার্ত্রে বা আলবেয়ার কামু-র অস্তিত্ববাদ পূর্ণতা পাওয়ার অনেক আগেই কল্লোলীয় ভবঘুরেদের মধ্যে এক প্রকারের 'অস্তিত্ববাদী সংকট' লক্ষ করা যায়। তাঁদের পদচারণা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখে নয়— এটিই হল প্রকৃত আধুনিকতা। বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' উপন্যাসের নায়ক যখন কোনো কারণ ছাড়াই মাইলের পর মাইল কলকাতার রাস্তায় হেঁটে চলে, তখন সেই হাঁটা কোনো শারীরিক ব্যায়াম নয়, বরং তা এক প্রকারের 'মানসিক পলায়নপরতা'। এই গন্তব্যহীনতাই প্রমাণ করে যে, আধুনিক মানুষ তাঁর শিকড় হারিয়ে ফেলেছে। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চায় যাতে নিজের একাকীত্বকে আড়াল করা যায়, আবার একই সাথে সে ভিড় থেকে আলাদা থাকতে চায় যাতে নিজের স্বকীয়তা বজায় থাকে। এই দ্বান্দ্বিক অবস্থানই কল্লোল যুগের ফ্লানুরকে এক জটিল ও বহুমাত্রিক চরিত্রে পরিণত করেছে। কল্লোল যুগের এই 'ভবঘুরে' চরিত্রটি কেবল ইউরোপীয় ফ্লানুর-এর অনুকরণ নয়। এটি বাংলার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক সংকটের ফসল। বেকারত্ব, ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল এবং চেনা গ্রামীণ মূল্যবোধের ভাঙন— এই সবকিছুর সম্মিলনে যে 'বাঙালি ফ্লানুর' তৈরি হল, সে অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং বিমূর্ত। সে কেবল রাজপথের দর্শক নয়, সে রাজপথের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ প্রধানত কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেও, তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত উপন্যাসগুলো যেমন, *মাল্যবান*, *কারুবাসনা*, *বিলাস* – এগুলি আধুনিক নাগরিক মনস্তত্ত্বের এক অন্ধকার ও অতলান্তিক আকর। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে যে নাগরিক অস্থিরতা ছিল, জীবনানন্দের হাতে তা এক প্রকারের 'স্থবিরতায়' রূপ নিয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নায়ক সেই তাত্ত্বিক 'ফ্লানুর', যিনি জনসমুদ্রের মাঝে থেকেও এক অলঙ্ঘ্য মানসিক প্রাচীর দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখেন। জীবনানন্দের বর্ণনায় কলকাতা শহরটি শার্ল বোদলেয়ারের প্যারিসের মতোই এক পরাবাস্তব রূপ পায়। তাঁর ফ্লানুর যখন কলকাতার রাস্তায় হাঁটেন, তখন তাঁর কাছে রাস্তাগুলো কেবল ইট-সুরকির পথ নয়, বরং সেগুলো এক একটি স্মৃতির গলি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "গভীর অন্ধকার এক—কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়।/ ম্লান বাতিগুলোর নিচে দিয়ে ছায়া হয়ে হেঁটে চলেছি আমি/ যেন হাজার বছরের এক প্রাচীন একাকীত্বের উত্তরাধিকারী।"[৬]

জীবনানন্দের উপন্যাসে আমরা দেখি, নায়ক ট্রামের লাইনের দিকে তাকিয়ে আছেন কিংবা কোনো এক অন্ধকার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলো দেখছেন। এই দেখা কেবল দৃষ্টির কাজ নয়, এটি এক প্রকারের 'ধ্যান'। কবির ভাষায়-

> "রাত্রির কোলকাতা এক অদ্ভুত আঁধার। এখানে ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোয় মানুষ নিজের ছায়া দেখে নিজেই ভয় পায়। এই শহর কি কেবলই ইঁদুরের মতো কুঁদুলে কোনো অস্তিত্বের নাম?"[৭]

ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যেমন বলেছিলেন, ফ্লানুর শহরকে পাঠ করেন একটি গ্রন্থাগারের মতো জীবনানন্দের নায়কও ঠিক তাই করেন। তাঁর কাছে কলকাতা এক 'অদ্ভুত আঁধার', যেখানে দিনের আলোতেও এক গভীর অন্ধকার প্রচ্ছন্ন থাকে। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *মাল্যবান*-এর নায়ক মাল্যবানকে আমরা অধিকাংশ সময় দেখি তাঁর ঘরের জানালায় কিংবা ছাদে। কিন্তু মানসিকভাবে তিনি এক নিরবচ্ছিন্ন পরিব্রাজক। ঘরের ভেতরে থেকেও নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি যোজন যোজন দূরে। এই যে নিজের বাসস্থানে থেকেও 'পরবাসী' হয়ে থাকা— এটিই আধুনিক ফ্লানুর-এর চরম পর্যায়। আলবেয়ার কামু-র 'দ্য আউটসাইডার' উপন্যাসের মেরসঁল-এর সাথে মাল্যবানের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মাল্যবান যখন মধ্যরাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার নৈঃশব্দ্য শোনেন, তখন তিনি আসলে নিজের অন্তরাত্মার শূন্যতাকেই পাঠ করেন। জীবনানন্দের 'ভবঘুরে' চরিত্রের কোনো গন্তব্য নেই, কারণ তাঁর কাছে 'সময়' এক বৃত্তাকার পথ। *কারুবাসনা* উপন্যাসের নায়ক হেম যখন চাকরি বা সংসারের দায়বদ্ধতা ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান, তখন তা কোনো সাময়িক পলায়নপরতা নয়। এটি হল জীবনের 'অসারতা' থেকে মুক্তির এক শৈল্পিক প্রয়াস। জীবনানন্দের ফ্লানুর কেবল চোখ দিয়ে শহর দেখেন না, তিনি শহরকে অনুভব করেন ঘ্রাণ এবং শব্দের মাধ্যমে। 'মেঠো ইঁদুরের মতো' বা 'মরা ঘাসের ঘ্রাণ' — এইসব রূপক যখন শহরের কর্কশ ফুটপাতে এসে মিশে যায়, তখন এক অদ্ভুত 'ঘ্রাণতাত্ত্বিক মানচিত্র' তৈরি হয়। জীবনানন্দ তাই বলেছেন –

> "হেম দেখল, ফুটপাথের ওপর মরা ঘাসের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। শহরের এই যান্ত্রিকতার ভেতরেও এক প্রাচীন অবিনশ্বর প্রকৃতি লুকিয়ে আছে, যা কেবল একজন ঘরছাড়া মানুষই অনুভব করতে পারে।"[৮]

আন্তর্জাতিক গবেষণার ভাষায় একে বলা হয় Sensory Mapping of the City।

জীবনানন্দের উপন্যাসে ফ্লানুর প্রায়শই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন। তিনি যখন বারবনিতা, ভিখারি বা রুগ্ন মানুষদের দেখেন, তখন তাঁর মনে কোনো নৈতিক ঘৃণা জন্মায় না। বরং তিনি দেখেন যে, আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতায় তিনিও ওই প্রান্তিক মানুষদের মতোই একজন 'উদ্বাস্তু'। এই যে নিজের আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে নাগরিক নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের মানে খোঁজা— এটিই জীবনানন্দকে এক 'ধ্রুপদী ফ্লানুর' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মিখাইল বাখতিন-এর 'ক্রোনোটোপ' তত্ত্বের নিরিখে জীবনানন্দের উপন্যাসে শহর কলকাতাকে বিশ্লেষণ করলে এক অভূতপূর্ব সত্য উদ্ভাসিত হয়। এখানে 'সময়' এবং 'স্থান' একে অপরের পরিপূরক। জীবনানন্দের নায়ক যখন কলকাতার রাস্তায় হাঁটেন, তখন তাঁর কাছে ১৯৩০ বা ৪০-এর দশকের বর্তমান সময়টি গৌণ হয়ে পড়ে। তিনি একইসাথে প্রাচীন ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া বা প্রাচীন বাংলার মেঠো পথের স্মৃতি বহন করেন। এই যে 'ঐতিহাসিক ফ্লানুর', যিনি কলকাতার ট্রামলাইনকে হাজার বছরের পুরনো কোনো পথের সমান্তরালে দেখেন— এটিই জীবনানন্দকে বিশ্বসাহিত্যের মার্সেল প্রুস্ত-এর সমগোত্রীয় করে তোলে। তাঁর ভবঘুরে সত্তাটি আসলে এক প্রকারের 'টাইম ট্রাভেলার' বা কালান্তরের যাত্রী। সমালোচকদের মতে –

> "জীবনানন্দের নায়ক কেবল হাঁটছেন না, তিনি আসলে আধুনিক সভ্যতার ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে এক অনির্দেশ্য সময়ের অভিমুখে যাত্রা করছেন।"[৯]

জীবনানন্দের গদ্যে একধরণের 'সিনেমেটিক' গুণাগুণ লক্ষ করা যায়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ফ্লানুরকে বর্ণনা করেছিলেন একজন 'ক্যামেরা অপারেটর' হিসেবে, যিনি শহরের খণ্ডচিত্রগুলোকে নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখেন। নায়ক ট্রামের জানালায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বসে দ্রুতগতিতে পার হয়ে যাওয়া শহরকে দেখছেন। সেখানে একটি ভাঙা দেওয়াল, একটি ম্লান ল্যাম্পপোস্ট, বা একজন পথচারীর মুখ— সবই যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন ফ্রেম বা 'শট'। এই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলিকে জোড়া দিয়ে তিনি এক বিষণ্ণ নাগরিক আখ্যান তৈরি করেন। আন্তর্জাতিক নন্দনতত্ত্বে একে সিনেমাটিক আরবানাইজেসন বলা হয়, যা জীবনানন্দের লেখনীতে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত। ফরাসি শব্দ একধরণের আধ্যাত্মিক একঘেয়েমি ফ্লানুর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনানন্দের *মাল্যবান* বা *বিলাস* উপন্যাসে এই 'ক্লান্তি' বা 'অবসাদ' এক দার্শনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। যখন জীবনের সব অর্থ ফুরিয়ে যায়, যখন দাম্পত্য বা জীবিকা কেবল এক যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন জীবনানন্দের নায়ক রাজপথের 'শূন্যতা'র মধ্যে মুক্তি খোঁজেন। আলবেয়ার কামু-র 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস'-এর সেই অর্থহীন সংগ্রামের চিত্রকল্পটি জীবনানন্দের ভবঘুরেদের জীবনেও সত্য। তবে জীবনানন্দের স্বকীয়তা এখানে যে, তিনি এই অবসাদকে কেবল নেতিবাচকভাবে দেখেননি; বরং এই অবসাদ থেকেই এক প্রকারের 'শিল্পচেতনা'র জন্ম দিয়েছেন। ট্রামের ঘর্ঘর, ফেরিওয়ালার ডাক, বা মধ্যরাতের কলকাতার গভীর নৈঃশব্দ্য— এই শব্দগুলো তাঁর নায়কদের অবচেতনে এক অদ্ভুত আলোড়ন তৈরি করে। তিনি যখন ভিড়ের কোলাহলকে এক প্রকারের 'সংগীত' হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি আর সাধারণ পথিক থাকেন না; তিনি হয়ে ওঠেন এক সনরউস ফ্লানুর। তিনি শব্দের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নিস্তব্ধতাকে খুঁজে বের করেন, যা আধুনিক নাগরিক গবেষণার একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দিক। জীবনানন্দ দাশের এই 'ভবঘুরে' চরিত্ররা আসলে আধুনিক মানুষের 'বিচ্ছিন্নতা'-কে এক অলৌকিক মহিমায় ভূষিত করেছেন। তাঁরা ঘর থেকে পালান না, বরং ঘর এবং বাহির— এই দুইয়ের মধ্যবর্তী এক ধূসর এলাকায় বাস করেন। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের এই দর্শনটি জয়েস কাফকা-র নাগরিক বিমূর্ততার সাথে সমান্তরালভাবে বিচার্য।

জীবনানন্দীয় দর্শনের সেই গহিন ও পরাবাস্তব জগত থেকে আমরা এখন পদার্পণ করছি এক উত্তাল, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এবং অস্তিত্ববাদী সংকটে জর্জরিত কলকাতায়। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকের বাংলা উপন্যাস ও কবিতায় 'ফ্লানুর' বা ভবঘুরে সত্তাটি এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দেশভাগ-পরবর্তী ছিন্নমূল জনস্রোত, খাদ্য আন্দোলন এবং নকশালবাড়ী আন্দোলনের পটভূমিতে কলকাতা শহরটি তখন আর কেবল এক মায়াবী কুয়াশাচ্ছন্ন নগরী রইল না; তা হয়ে উঠল এক 'প্রতিবাদী রণক্ষেত্র'। এই সময়ে বাংলা উপন্যাসে যে 'ভবঘুরে' বা ফ্লানুর-এর উদ্ভব ঘটল, তিনি জীবনানন্দের মতো কেবল অন্তর্মুখী নন, বরং তিনি একাধারে বিষণ্ণ এবং বিদ্রোহী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন *প্রতিদ্বন্দ্বী* বা সমসাময়িক ছোটগল্পসমূহ আমরা এমন এক ফ্লানুর-এর সাক্ষাৎ পাই, যার কোনো নির্দিষ্ট কর্মসংস্থান নেই, কিন্তু যার পায়ের তলায় রয়েছে কলকাতার সমস্ত রাজপথ।

> "আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি তা আমিই জানি। এই শহর আমাকে দু-হাতে জাপটে ধরে আছে, অথচ আমি হাড়িকাঠের নিচে রাখা একটা পশুর মতো ছটফট করছি।"[১০]

এখানকার ফ্লানুর কোনো উচ্চবিত্ত শৌখিন পর্যটক নন, বরং তিনি এক 'অস্তিত্ববাদী ভবঘুরে'। চাকুরির সন্ধানে বা ইন্টারভিউয়ের অবসাদে তিনি যখন ডালহৌসি বা চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়ান, তখন তাঁর চোখে ধরা পড়ে নাগরিক বৈষম্যের এক নগ্ন রূপ। সুনীলের ফ্লানুর প্রায়শই নাগরিক ভিড়ের মধ্যে নিজের কামনা-বাসনা ও একাকীত্বকে খুঁজে ফেরেন। তাঁর কাছে শহরটি এক 'যৌন আবেদনময়ী নারী'র মতো, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে প্রলোভন ও ঘৃণা। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যেমন বলেছিলেন, ফ্লানুর পণ্যের মোহে আচ্ছন্ন হতে চান আবার তাকে অস্বীকারও করেন— সুনীলের নায়কদের ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রধানত কবি, কিন্তু তাঁর গদ্যে এবং জীবনচর্যায় 'ফ্লানুর' সত্তাটি এক অন্য উচ্চতা লাভ করেছে। তাঁর ভবঘুরেপনা এক প্রকারের 'নৈরাজ্যবাদী মুক্তি'। শক্তির ফ্লানুর কেবল কলকাতার রাস্তায় আবদ্ধ নন; তিনি শহর থেকে পালিয়ে যান অরণ্যে, আবার অরণ্যের নির্জনতা নিয়ে ফিরে আসেন শহরের কোলাহলে। তাঁর কাছে 'হাঁটা' মানেই হল প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা। এই যে ঘরছাড়া হওয়ার এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এটিই তাঁকে আধুনিক ফ্লানুর তত্ত্বের এক 'বোহেমিয়ান' প্রতিরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অমোঘ উক্তি বার বার উচ্চারিত হয় –

> "অবনী বাড়ি আছো? ...দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া/ কেবল আমি একলা জেগে আছি।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অথবা –

> "রাস্তা আমায় ডাকছে, আমি যাচ্ছি।/ ঘরের চাবিটা ড্রেনেই ফেলে এসেছি— এখন পুরো শহরটাই আমার অন্দরমহল।"[১২]

এই সময়ের উপন্যাসে যেমন সমরেশ মজুমদারের *উত্তরাধিকার* বা কালবেলার প্রাথমিক পর্যায় ফ্লানুর চরিত্রটি এক রাজনৈতিক মাত্রা পায়। ফ্লানুর যখন মিছিলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যান, তখন তিনি সেই মিছিলের অংশ হয়েও যেন বিচ্ছিন্ন। তিনি ডায়েরি বা কলমে ধারণ করেন স্লোগান, টিয়ার গ্যাস আর পুলিশের বুটের শব্দ। আন্তর্জাতিক নন্দনতত্ত্বে একে বলা হয় রাজনেতিক ভবঘুরে। এখানকার ভবঘুরে চরিত্রটি নাগরিক ইতিহাসের এক সক্রিয় সাক্ষী। তিনি রাজপথকে কেবল দেখছেন না, রাজপথের প্রতিটি কম্পন তাঁর ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছে। ষাট দশকের 'হাংরি জেনারেশন' বা ক্ষুধার্ত আন্দোলনের লেখকরা ফ্লানুর সত্তাটিকে এক চরম ও বীভৎস রূপ দিলেন। মলয় রায়চৌধুরী বা সমীর রায়চৌধুরীদের লেখায় ভবঘুরে সত্তাটি আর কোনো মার্জিত দর্শক নয়। সে নর্দমার পাশে বসে থাকা ভিখারি বা ডাস্টবিনের কুকুরের সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। মধ্যবিত্ত আভিজাত্যের যে মুখোশ কল্লোল যুগে বা জীবনানন্দের সময়ে কিছুটা হলেও অবশিষ্ট ছিল, তা এখানে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এই 'প্রান্তিক ফ্লানুর' আধুনিক নাগরিক সমাজকে এক অস্বস্তিকর আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই সময়ের লেখকদের ওপর জাঁ-পল সার্ত্রে ও আলবেয়ার কামু-র অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কোনো কিছুরই কোনো স্থায়ী অর্থ নেই— এই চেতনা থেকেই ষাটের দশকের ফ্লানুররা রাতভর কলকাতার রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। কফি হাউসের আড্ডা থেকে বেরিয়ে যখন তাঁরা একা ফুটপাথে হাঁটতেন, তখন সেই একাকীত্বই ছিল তাঁদের জীবনের পরম সত্য। এই পর্যায়টি বাংলা সাহিত্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ভবঘুরেপনার জন্ম দেয়।

> "শহরের এই অগণিত মানুষের ভিড়ে আমি কেবল একটি চলন্ত ছায়া,/ আমার কোনো ঘর নেই, কোনো গন্তব্য নেই—শুধু এই বিরামহীন হাঁটা।"[১৩]

পঞ্চাশ-ষাট দশকের উপন্যাসে শহর কলকাতার 'রাত্রি' এক বিশেষ ব্যঞ্জনা পায়। দিনের বেলার ব্যস্ত শহর আর রাতের বেলার জনশূন্য ফুটপাথ— এই দুইয়ের মধ্যে যে বৈপরীত্য, তা ভবঘুরে সত্তাকে এক গভীরতর দর্শনে জারিত করে। এই সময়ের ভবঘুরে কেবল ম্লান আলো দেখেন না, তিনি দেখেন রাতের অন্ধকার চিরে জেগে ওঠা অপরাধ, পতিতালয় এবং চোরাকারবারিদের জগত। তাঁর দৃষ্টিতে তখন শহরটি এক 'নৈশচারী হিংস্র জন্তু'র মতো। তিনি সেই অন্ধকারের অংশ হয়ে যান যাতে সমাজের প্রকৃত কদর্যতা ও সত্যকে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক তত্ত্বে একে বলা হয় নৈশচারী যা নাগরিক একাকীত্বের এক চরম বহিঃপ্রকাশ। এই যুগের ভবঘুরেরা কেবল রাজপথেই সীমিত ছিলেন না, তাঁদের পদচারণার এক বড় অংশ জুড়ে ছিল কলেজ স্ট্রিটের 'কফি হাউস'। আড্ডার মাঝখানে থেকেও একধরণের নিঃসঙ্গতা বজায় রাখা— এটিই ছিল এই যুগের আধুনিকতা। তাঁরা সমবেতভাবে স্বপ্ন দেখতেন বিপ্লবের, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও একাকী। এই যে যৌথ আড্ডা থেকে বেরিয়ে একা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটা, এটিই প্রমাণ করে যে তাঁদের ভবঘুরেপনা আসলে এক প্রকারের 'বৌদ্ধিক বিলাস' নয়, বরং তা ছিল অস্তিত্বের প্রয়োজনে অনিবার্য। ফরাসি দার্শনিক অঁরি ল্যাফেভর-এর 'রিদমানালিসিস' তত্ত্বের নিরিখে এই সময়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ষাটের দশকের ফ্লানুররা শহরের 'ছন্দ' বা 'রিদম' ধরতে পারতেন। মিছিলের স্লোগান, পুলিশের সাইরেন, আর মানুষের হাহাকার— সবমিলিয়ে শহরের যে একটি নির্দিষ্ট স্পন্দন তৈরি হয়েছিল, ভবঘুরে বা ফ্লানুররা সেই স্পন্দনের সাথে নিজেদের হৃৎস্পন্দন মিলিয়ে নিতেন। তাঁরা কেবল দর্শক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন শহরের সেই কম্পনের সংগ্রাহক। তাঁদের উপন্যাসে যেমন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই নাগরিক অস্থিরতা এক বিশেষ 'গদ্যরীতি' বা 'স্টাইল' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময়ের ভবঘুরেদের প্রধান ট্র্যাজেডি হল তাঁদের 'গৃহহীনতা'। এটি কেবল আক্ষরিক অর্থে মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা নয়, বরং এটি একপ্রকারের মানসিক ও দার্শনিক উদ্বাস্তু অবস্থা। দেশভাগের ক্ষত তাঁদের মনের মধ্যে এমন এক 'শূন্যতা' তৈরি করেছিল যে, তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট ঘর বা আদর্শে থিতু হতে পারছিলেন না। তাই রাজপথই হয়ে উঠেছিল তাঁদের একমাত্র ধ্রুব সত্য। এই শিকড়হীনতা তাঁদের ফ্লানুর সত্তাকে আরও বেশি যাযাবর ও ভবঘুরে করে তুলেছিল। উত্তর-পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'উত্তপ্ত ফ্লানুর' আসলে এক চরম ক্ষয়ের গান গেয়েছেন। তাঁর পদচারণায় কোনো শান্তি ছিল না, ছিল এক বিরামহীন অন্বেষণ— কখনও বিপ্লবের, কখনও বা স্রেফ নিজের সত্তার।

বিগত শতকের ধূলিমলিন রাজপথ থেকে একুশ শতকের কাঁচ ও স্টিলের 'স্মার্টসিটি'— এই রূপান্তর কেবল স্থাপত্যের নয়, বরং ফ্লানুর বা ভবঘুরে সত্তার এক আমূল বিবর্তন। একুশ শতকের নগরায়ন এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি 'ফ্লানুর' বা নাগরিক ভবঘুরে সত্তাকে এক নতুন ও বিমূর্ত সংজ্ঞায় আবদ্ধ করেছে। আগেকার দিনে ফ্লানুর ছিলেন রাজপথের এক শরীরী পথিক; আজ তিনি এক অদৃশ্য সত্তা, যিনি বাস্তব জগতের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতের অলিগলিতে বেশি বিচরণ করেন। সমকালীন বাংলা উপন্যাসে যেমন তিলোত্তমা মজুমদার, নবারুণ ভট্টাচার্য বা পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের রচনা এই 'ডিজিটাল ফ্লানুর'-এর প্রতিকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্তমান যুগের ফ্লানুর আর কেবল ট্রামলাইন বা ফুটপাথে সীমাবদ্ধ নন। তাঁর হাতে থাকা স্মার্টফোনটি এখন তাঁর নতুন 'রাস্তা'। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যেমন শহরের 'আর্কেইড' বা বিপণি বিতানগুলোতে ঘুরে বেড়ানোকে ফ্লানুর-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলেছিলেন, আধুনিক ফ্লানুর ঠিক তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার 'টাইমলাইন' বা নিউজফিডে ঘুরে বেড়ান। এই যে অনির্দেশ্যভাবে এক লিঙ্ক থেকে অন্য লিঙ্কে চলে যাওয়া, এক প্রোফাইল থেকে অন্য প্রোফাইলে পরিভ্রমণ করা— এটিই হল 'ডিজিটাল ফ্লানেরি'। এখানে দৃশ্যগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বিচ্ছিন্ন, যা জীবনানন্দীয় মঁতাজের এক আধুনিক ও যান্ত্রিক সংস্করণ। নবারুণ ভট্টাচার্যের *হার্বার্ট* বা তাঁর পরবর্তী গল্পগুলোতে আমরা এক ভিন্ন ধরণের ভবঘুরে পাই।

> "শহরটা এখন একটা বিশাল ডাস্টবিন। স্মার্টসিটির আলোর নিচে হার্বার্টরা মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাদের দেখতে পায় না, সিসিটিভি-ও না।"[১৪]

হার্বার্ট বা তাঁর 'ফ্যাঁতড়ু'-রা কলকাতার সেই সব অঞ্চলে বিচরণ করে যা উন্নয়নের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁরা ড্রেন, ভাগাড় আর শ্মশানের ভবঘুরে। তাঁরা আধুনিক 'স্মার্টসিটি'-র চকচকে রূপকে অস্বীকার করে শহরের 'বর্জ্য' ও 'ধ্বংসাবশেষ' -এর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। এটি হল একপ্রকারের বিধ্বংসী ভবঘুরেপনা, যা কর্পোরেট নগরায়নের মূলে কুঠারাঘাত করে। আধুনিক শহর এখন সিসিটিভি ক্যামেরা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নজরদারিতে বন্দি।

> "The modern city is a transparent cage where the wanderer is always under the gaze of an unseen authority."[১৫]

মিশেল ফুকো-র 'প্যানোপটিকন' তত্ত্বের নিরিখে দেখলে বোঝা যায়, আজকের ফ্লানুর আর আগের মতো 'অদৃশ্য' নন। তিনি যখন রাজপথে হাঁটেন, তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ডিজিটাল ম্যাপে রেকর্ড করা হয়। এই নজরদারি ফ্লানুর-এর চিরায়ত 'স্বাধীনতা' বা 'নির্লিপ্ততা'কে খর্ব করেছে। সমকালীন উপন্যাসে এই 'অবরুদ্ধ ভবঘুরে'র হাহাকার ফুটে ওঠে, যিনি ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যেতে চাইলেও প্রযুক্তির কারণে সর্বদা চিহ্নিত হয়ে পড়েন। বর্তমান যুগের ফ্লানুর মানসিকভাবে অনেক বেশি উদ্বাস্তু। তিনি সশরীরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক গন্তব্যহীন বিষণ্ণতায় আক্রান্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজার হাজার 'বন্ধু' থাকলেও বাস্তব জীবনে তিনি চরম নিঃসঙ্গ। এই বৈপরীত্যই একুশ শতকের ভবঘুরে সত্তাকে জন্ম দিয়েছে। তিনি এখন আর রাজপথের ধুলোবালি স্পর্শ করেন না, বরং স্ক্রিনের নীল আলোয় নিজের একাকীত্বকে আস্বাদন করেন। তিলোত্তমা মজুমদারের কিছু উপন্যাসে নাগরিক জীবনের এই যে 'ইনডোর আইসোলেশন' বা গৃহবন্দি নিঃসঙ্গতা— তা আসলে ফ্লানুর-এর এক ট্র্যাজিক বিবর্তন। আজকের ভবঘুরের পথচলা অনেকটা অ্যালগরিদম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি কী দেখবেন, কোথায় যাবেন, তা প্রযুক্তির দ্বারা নির্ধারিত। আগেকার ফ্লানুর ছিলেন স্বাধীন পর্যবেক্ষক; আজকের ফ্লানুর হলেন একজন 'ভোক্তা'। তবুও, সমকালীন কিছু নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসে দেখা যায়, লেখক তাঁর নায়ককে এই অ্যালগরিদমের বৃত্ত ভেঙে বের করে আনতে চাইছেন। তিনি আবার ফিরে যেতে চাইছেন কলকাতার সেই পুরনো জীর্ণ গলিগুলোতে, যেখানে এখনও প্রযুক্তির স্পর্শ পৌঁছায়নি। এই ফিরে যাওয়ার আকুলতাই হল আধুনিক বাংলা উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। একুশ শতকের ফ্লানুর তাঁর শরীরী অস্তিত্ব হারিয়ে এক 'ডেটা' বা তথ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবুও তাঁর সেই চিরন্তন 'অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি' ও 'নাগরিক বিষণ্ণতা' এখনও অমলিন। তিনি এখন রাজপথের চেয়ে মানুষের অবচেতনের অন্ধকার অলিগলিতে বেশি বিচরণ করেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "একলা হতে হতে আমি এতটাই একা হয়ে গেছি/ যে এখন ভিড় দেখলেই আমার নিজের ছায়া বলে ভুল হয়।"[১৬]

কল্লোল যুগের কর্কশ ফুটপাথ থেকে শুরু করে একুশ শতকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাশাসিত 'স্মার্টসিটি' পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যে দীর্ঘ পরিক্রমা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তার কেন্দ্রে বিরাজমান রয়েছেন এক চিরন্তন গন্তব্যহীন পথিক— আমাদের আলোচিত 'ফ্লানুর' বা নাগরিক ভবঘুরে। এই গবেষণার পরতে পরতে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পাশ্চাত্য তত্ত্বে শার্ল বোদলেয়ার বা ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যে 'ফ্লানুর' সত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তা কেবল অনুকরণে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা বাঙালির নিজস্ব ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, দেশভাগের যন্ত্রণা এবং অস্তিত্ববাদী সংকটের রসে জারিত হয়ে এক অনন্য দেশজ রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমরা দেখেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুর কলমে যে ফ্লানুর-এর প্রথম পদচারণা শুরু হয়েছিল, তা ছিল মূলত নাগরিক অবক্ষয় ও মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতার এক শৈল্পিক অভিব্যক্তি। জীবনানন্দ দাশের হাতে সেই পদচারণা এক 'পরাবাস্তব ধ্যানে' রূপান্তরিত হল, যেখানে শহর কলকাতা আর কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান রইল না— তা হয়ে উঠল এক মহাজাগতিক একাকীত্বের মানচিত্র। পরবর্তীকালে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক হাহাকার ও 'ক্ষুধার্ত' প্রজন্মের বিদ্রোহ সেই নির্জন পথিককে রাজপথের উত্তপ্ত মিছিলে দাঁড় করিয়ে দিল। সেখানে ফ্লানুর আর কেবল দর্শক নন, তিনি হয়ে উঠলেন ইতিহাসের এক ক্ষতবিক্ষত সাক্ষী। একুশ শতকের এই ডিজিটাল সন্ধিক্ষণে এসে ফ্লানুর সত্তাটি এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের সম্মুখীন। আজকের ভবঘুরে সশরীরে রাজপথে বিচরণ করার চেয়ে ভার্চুয়াল জগতের অলিগলিতে বেশি পরিভ্রমণ করেন। প্রযুক্তির তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং অ্যালগরিদমের শাসন তাঁর চিরায়ত 'অদৃশ্য' থাকার স্বাধীনতাকে হরণ করলেও, তাঁর অন্তরের সেই 'অস্তিত্ববাদী শূন্যতা' আজও অমলিন। আজকের ফ্লানুর হয়তো স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আঙুল ঘষেন, কিন্তু তাঁর সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি আজও জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার' কিংবা সুনীলের 'খালি হাত'-এর হাহাকারকেই বহন করে চলেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলা উপন্যাসের এই 'ভবঘুরে' চরিত্রটি আসলে আধুনিক মানুষের এক অবিনশ্বর প্রতিচ্ছবি। তিনি নাগরিক ভিড়ের মাঝে থেকেও কেন নিঃসঙ্গ, কেন তাঁর পদচারণা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখে নয়— এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রকৃত স্বরূপটি অনুধাবন করতে পারি। শহর বিবর্তিত হয়, প্রযুক্তির দাপটে রাজপথের রূপ পাল্টে যায়, কিন্তু সেই 'নির্জন পথিক' হারান না। তিনি চিরকালই নাগরিক অরণ্যের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন— কখনও দর্শক হিসেবে, কখনও বিমূর্ত ছায়া হিসেবে, আবার কখনও বা আমাদেরই অবচেতনের এক গোপন প্রতিধ্বনি হিসেবে। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের মানচিত্রে বাংলা উপন্যাসের এই 'ফ্লানুর' সত্তাটি তাই কেবল একটি সাহিত্যিক চরিত্র নয়, বরং তা আধুনিক মানবসভ্যতার এক চিরন্তন ও অপরিহার্য দর্শন।

Reference:

১. Benjamin, Walter, The Arcades Project, Translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin, Harvard University Press, 1999, p. 417
২. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, পাঁক, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯২৬, পৃ. ২৫
৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৯৭৩, পৃ. ১৫
৪. বসু, বুদ্ধদেব, সাড়া, সিগনেট প্রেস, ১৯৫০, পৃ. ৪২
৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, ১৯৭৩, পৃ. ১৫
৬. দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভরদ্বাজ পাবলিশার্স, ১৯৫৪, পৃ. ৪২
৭. দাশ, জীবনানন্দ, মাল্যবান, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮
৮. দাশ, জীবনানন্দ, *কারুবাসনা*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, ১৯৮৬, পৃ. ৪৭
৯. বসু, অম্বুজ, একটি নক্ষত্র আসে, দে'জ পাবলিশিং, সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ৪২
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কবিতা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃ. ১৮
১১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১, পৃ. ১২
১২. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১, পৃ. ৪৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 320 - 328
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৩. মজুমদার, বিনয়, ফিরে এসো চাকা, গ্রিটিংস পাবলিকেশনস, ১৯৬২, পৃ. ৪৭

১৪. ভট্টাচার্য, নবারুণ, হার্বার্ট, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ২৫

১৫. Foucault, Michel, Discipline and Punish : The Birth of the Prison, Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, 1977, p. 201

১৬. ঘোষ, শঙ্খ, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪, পৃ. ১৫

Bibliography:

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *প্রতিদ্বন্দ্বী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪, পৃ. ১২-৪৫

দাশ, জীবনানন্দ, *মাল্যবান*, নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৭৩, পৃ. ২৯-১০২

দাশ, জীবনানন্দ, *কারুবাসনা*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, ১৯৮৬, পৃ. ১৫-৬৪

নবারুণ ভট্টাচার্য, *হার্বার্ট*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৭-৫৩

মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *পাঁক*, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯২৬, পৃ. ২০-৮৮

বসু, বুদ্ধদেব, *সাড়া*, কল্লোল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩০, পৃ. ১৮-৭৫

মজুমদার, তিলোত্তমা, *রাজপাট*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২১০-২৭৫

Baudelaire, Charles. *The Painter of Modern Life and Other Essays*. Translated by Jonathan Mayne, Phaidon Press, 1964, pp. 1-40

Benjamin, Walter. *The Arcades Project*. Translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin, Harvard University Press, 1999, pp. 416-455

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, 1977, pp. 195-228

Lefebvre, Henri. *Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life*. Translated by Stuart Elden and Gerald Moore, Continuum, 2004, pp. 12-25